গণসংস্কৃতির লড়াই

মফিজুর রহমান লালটু

গণসংস্কৃতির লড়াই
মফিজুর রহমান লালটু

সমসমাজ প্রকাশনী
প্রকাশ কাল: ফেব্রুয়ারী ২০২৫

প্রকাশকের কথা

গণসংস্কৃতির লড়াই পুস্তিকাটি ১০ নভেম্বর ২০২৩ সালে লেখা। লেখক মফিজুর রহমান লালটু একজন সংস্কৃতির কর্মী ও সংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতার আলোকে এই পুস্তিকা লিখেছেন।

গণসংস্কৃতির লড়াই

মফিজুর রহমান লালটু

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন স্মরণকালের সবচেয়ে খারাপ সময় পার করছে। রাজনৈতিক অবস্থা ততোধিক খারাপ। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার; মতপ্রকাশ বা ভোটদানের অধিকার দুটোই কেড়ে নিয়েছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার। দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন ঊর্ধ্বগতি, ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের লুটপাট, ঘুষ-দুর্নীতি, গুম, খুন, হয়রানিমূলক মামলা, সন্ত্রাস, সাইবার নিরাপত্তা আইনসহ নিবর্তনমূলক নানা আইনকানুন ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার এক ভয়ের সংস্কৃতি কায়েম করেছে। সব মিলিয়ে জনগণের ঘাড়ে চেপে বসেছে এক ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন।

দেশের অতীত অভিজ্ঞতা বিচারে এর বিরুদ্ধে তীব্র সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে ওঠা ছিল কাঙ্খিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো, দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বৃহত্তম প্ল্যাটফর্ম যেটা এরশাদ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল, সেই সাংস্কৃতিক জোট সরকারের এ সকল অগণতান্ত্রিক, নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না গড়ে বরং সরকারের সহযোগী হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছে। সীমাহীন লুটপাট, ঘুষ, দুর্নীতি, অর্থ পাচার, সাধারণ মানুষের অবর্ণনীয় দুরাবস্থা এবং সরকারের ফ্যাসিবাদী আচরণকে আড়াল করার কৌশল হিসেবে পরিকল্পিতভাবে এসকল বিষয় এড়িয়ে জনগণের সংকট, জীবন-জীবিকার সাথে সম্পর্কহীন বিষয়কে সামনে নিয়ে আসা অথবা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বহু টাকা ব্যয় করে নানা সাংস্কৃতিক

উৎসব আয়োজনে সরকারের মহিমা প্রচার, গুণগান ও প্রশস্তির মধ্য দিয়ে জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ঘুরানোর চেষ্টার তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। এবং সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা, ব্যবসা ও ব্যক্তিগত লাভালাভির সন্ধানে হন্যে হয়ে ছুটছেন।

সংস্কৃতিকে বলা যায় প্রবৃত্তি ও পরিবেশের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্বের সামাজিক ও নান্দনিক প্রকাশ। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রধান ক্ষেত্র মানুষের মনোজগৎ। লেখক শিল্পী সাহিত্যিকদের সৃষ্টি মূলতঃ মানুষের চেতনার জগতে ক্রিয়া করে থাকে। এই সৃষ্টিকর্ম মানুষকে ভাবায়, চিন্তার খোরাক জোগায়। সমাজের চারপাশের জগৎ সম্পর্কে জানতে, প্রশ্ন করতে শেখায়, ব্যক্তির রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটায়, সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। বস্তুতঃ সাংস্কৃতিক আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনেরই এক রূপ। রাজনৈতিক আন্দোলন প্রত্যক্ষ আর সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরোক্ষ। রাজনৈতিক আন্দোলন বাহ্যিক পরিবর্তন সাধন করে, আর সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালায় মানসলোকে। সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রাথমিকভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময় উদ্দীপনা যোগায়। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রধান কর্তব্য হলো ব্যাপক জনগণের চেতনায় উন্নত জীবন, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন জাগিয়ে তোলা; শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাহসের সাথে উঠে দাঁড়াতে উৎসাহ যোগানো, জীবন ও সমাজকে ভাল করে জানতে বুঝতে সাহায্য করা, স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বব্যাপী নিপীড়িত মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলা। আর এ কর্তব্য সম্পাদনের প্রধান উপায় হচ্ছে তার সৃষ্টিশীলতা।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের অনুগামী, কখনো হাত ধরাধরি করে চলে। আবার কখনো তা রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করে, পথ দেখায়। রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিঘাত সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এসে পড়ে, সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে কবিতা, গান, নাটক, চিত্রকলাসহ শিল্প-সাহিত্যের নানা মাধ্যম। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাজনীতি শ্রেণীতে বিভক্ত, সংস্কৃতিও তেমনি শ্রেণী নিরপেক্ষ নয় - তা নির্দিষ্ট শ্রেণীরই সেবাদান করে থাকে, নির্দিষ্ট শ্রেণী রাজনীতির স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে। সংস্কৃতির সেবাদানকারী অর্থাৎ প্রত্যেক কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী বা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে বিষয়টি ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে সত্য। সংস্কৃতির এই দুই ধারা অর্থাৎ জনগণের সংস্কৃতি বা গণসংস্কৃতি এবং শাসকশ্রেণী বা বিত্তবানদের ভোগবাদী সংস্কৃতি পরস্পর বিপরীত বা দ্বান্দ্বিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে।

জনগণের বাস্তব জীবন থেকে চেতনা জগৎ, চেতনা জগৎ থেকে বাস্তব জীবন এবং পুনরায় বাস্তব জীবন থেকে চেতনা জগৎ– এভাবে পর্যায়ক্রমে যে দ্বন্দ্বময় ঘটনাধারা প্রতিদিন ঘটে চলেছে, তাকে তীব্র ও সংহত রূপ দেবার কর্তব্য পালন করেন বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মীরা তাদের সাহিত্য, শিল্পকর্মে। আর এটাও সত্য যে, কাব্য, সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র, ললিতকলা ইত্যাদি সাহিত্য ও শিল্পকর্ম হচ্ছে সংস্কৃতির বাহন এবং একইসাথে তা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হাতিয়ার।

অনেকগুলো বিভ্রান্তির মধ্যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কে এ রকম একটা বিভ্রান্তি চালু রয়েছে যে, সাংস্কৃতিক আন্দোলন মানে গান, বাজনা, নাটক করা, ইত্যাদি। কিন্তু বিষয়টি এমন স্থুল ও সীমাবদ্ধ নয়। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রশ্নটি গভীর, ব্যাপক এবং একইসাথে বহুমাত্রিক। এর গুরুত্ব উপেক্ষা করলে, অবহেলা করলে বা স্থুলভাবে দেখলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম প্রাণবন্ত, গভীর ও ব্যাপক রূপলাভ করতে পারে

না। আমাদের দেশে জনগণের ঘাড়ে বর্তমানে এক চরম ফ্যাসিবাদী শাসন চেপে বসেছে।

মানুষ এক ভীতিকর দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করছে, মুখ ফুটে যেমন কিছু বলতে পারছে না, প্রতিবাদে নামতেও ভয় পাচ্ছে। জনগণের এ রকম চরম দুঃসময়েও স্বৈরাচারী-ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক কর্মীরা কী ভূমিকা পালন করছেন? আদৌও কোন প্রতিবাদ-সংগ্রাম সংগঠিত করছেন কি? এ রকম পরিস্থিতিতে লেখক শিল্পী সাহিত্যিকদের সহসের সাথে এগিয়ে আসার কথা। একদা আমাদের দেশের লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের রচনা, কবিতা, গান, নাটক, শিল্পকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে সেই ভূমিকা পালন করেছেন। বিশ্বের জনগণের পক্ষের প্রকৃত শিল্পী-সাহিত্যিকরা নিপীড়িত জনগণ ও মানবতার পক্ষে সেই কর্তব্যই পালন করে গেছেন।

ইউরোপে ১৯৩৫ সাল থেকে ফ্যাসিবাদী আক্রমণ শুরু হয়। এর বিরুদ্ধে মানবতার পক্ষে বিশ্বের বিখ্যাত সব লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হন। ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে ১৯৩৫ সালের ২১ জুন প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা প্রাতিবাদী সমাবেশসহ লেখনী ও শিল্পকর্মের ভেতর দিয়ে ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলা ও তাকে প্রতিহত করার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

কালজয়ী শিল্পী, সংগ্রামী মানুষের প্রেরণা পাবলো পিকাসোর আঁকা 'গুয়েরনিকা' পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পকর্ম। যুদ্ধ ও ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে 'গুয়েরনিকা' এক অনন্য সৃষ্টি। এই শিল্পকর্মের প্রেক্ষাপট হলো যুদ্ধ ও বিভৎসতা। ১৯৩৭ সালের ২৬ এপ্রিল জার্মান বোমারু বিমান স্পেনের সুপ্রাচীন শহর গুয়েরনিকায় বোমা বর্ষণ করে শহরটিকে ধ্বংস করে দেয়। এর ঠিক ছ'দিন পর পিকাসো এ ছবিটি আঁকা শুরু করেন। তিনি এর নাম দেন 'গুয়েরনিকা'। গুয়েরনিকার পরতে পরতে যুদ্ধের বিভৎসতা ও ধ্বংসলীলা ফুটে উঠেছে। আমরা জানি ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে কার্যত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, আর ১৯৪১ সালের ২২ জুন জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে এই যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সে পিকাসো একদিন তাঁর স্টুডিওতে ছবি আঁকছিলেন। সে সময় বাইরে পাহারারত এক জার্মান সৈন্য স্টুডিওতে ঢুকে পড়ে। স্টুডিওর এক কোণে দাঁড় করানো গুয়েরনিকার ক্যানভাসের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সৈন্যটি পিকাসোকে জিজ্ঞেস করে, 'এটা তুমি করেছ?' সৈনিকের পোশাক পরা ঐ ব্যক্তির দিকে আঙুল তুলে অত্যন্ত ঘৃণাভরে ক্ষুব্ধকণ্ঠে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'তা নয়, এটা তোমরা করেছ।'

শিল্পীর দায়বোধ সম্পর্কে গণমানুষের এই শিল্পীর বক্তব্য খুবই স্পষ্ট, তিনি বলেছেন, "আর্টিস্ট কাকে বলবো? যদি সে শিল্পী হয় তাহলে তার শুধু চোখই থাকবে, যদি গায়ক হয় তাহলে শুধু তার কানই থাকবে, যদি মুষ্টিযোদ্ধা হয় তাহলে থাকবে শুধু তার মাংসপেশী? শিল্পীর কি এমনই অর্থ? তা নয়। শিল্পী সমাজ ও রাজনীতি সচেতন মানুষ। হৃদয়বিদারক ভয়াবহ কিংবা আনন্দদায়ক যে কোন ঘটনায় সে সর্বদা স্পর্শকাতর, জাগ্রত, তাতে সর্বতোভাবে সাড়া দেয়। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে কোনই আগ্রহ নেই এমন একজন কী করে শিল্পী হতে পারে? যে জীবনের স্বাদ জনসাধারণ আমাকে দিয়েছে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কী করে আমি থাকতে পারি?

ছবি আঁকা শুধু ঘর সাজানোর জন্য নয়। ছবি হচ্ছে হাতিয়ার, যুদ্ধের আয়ুধ, যা দিয়ে আমি আত্মরক্ষা করি, শত্রুকে আঘাত করি। আমি ছবি আঁকাকে শুধুমাত্র আনন্দদানের, কেবলমাত্র মন ফেরানোর এক মনোজ্ঞ চারুকলা মনে করিনি। ছবি ও রঙ আমার অস্ত্র, সেই অস্ত্র দিয়ে সর্বদা আমি পৃথিবী ও মানুষের চেতনার আরও গভীরে প্রবেশ করতে চেয়েছি, অনুভব করেছি, প্রতিদিন আমাদের মুক্তিকে প্রসারিত করতে চেয়েছি। প্রচণ্ড নির্যাতনের বিগত এই বছরগুলি বুঝতে শিখিয়েছে যে, আমাকে শুধু আমার শিল্পের জন্য সংগ্রাম করলে চলবে না, আমাকে আমার সত্ত্বা দিয়ে লড়তে হবে, মানবতার জন্য, শুধু খ্যাতির জন্য নয়।" কোন প্রলোভন, কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে শিল্পী পিকাসো বা পিকাসোর মত মানুষেরা কখনো আত্মমর্যাদা বিক্রি করেননি, মাথা নত করেননি, কারণ তারা ছিলেন মানুষের বিবেক।

আন্তর্জাতিকভাবে লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা যখন ফ্যাসিবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার তখন পরাধীন ভারতবর্ষে চলছে মন্বন্তর। অসহায় মনুষ ধুকে ধুকে মরছে। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছিল ফ্যাসিবাদী আক্রমণ এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিস্থিতিকে কত ভয়ানক অবস্থার মধ্যে নিয়ে যাবে। ভারতের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা বসে থাকতে পারেন নি। তাঁরা এর বিরুদ্ধে ভারতজুড়ে বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। ১৯৩৬ সালে ভারতবর্ষের প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা সমবেত হন এবং ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রখ্যাত লেখক মুন্সি প্রেমচাঁদ ও লেখক-রাজনীতিক সাজ্জাদ জহিরকে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে গঠন করেন 'লিখিল ভারত প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'। আক্রমণ আরও প্রসারিত হতে থাকলে ১৯৩৭ সালে গঠিত হয় 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এই সংগঠনের গর্ভ থেকেই ১৯৪৩ সালের ২৫ মে জন্ম নেয় ভারতের সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ভারতীয় গণ-নাট্য সংঘ'। বহু ক্ষেত্রে বিখ্যাত, গুণী, লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা এই সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত হন। জনগণের পক্ষে প্রগতিশীল ধারার সংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই সংগঠনের রয়েছে বহুমাত্রিক ও অনন্যসাধারণ ভূমিকা।

ভারত উপমহাদেশে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় গত শতাব্দীর ত্রিশের শেষ দিক থেকে চল্লিশের দশক প্রগতি চেতনার উদ্ভাসে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। কবিতা, গান, নাটক, গল্প-উপন্যাস, নাচ, গীতিনাট্য, গণসংগীত, লোকগীতি, কবিগান, চিত্রকলার মত নানা ক্ষেত্রে এই চেতনার প্রকাশ সমাজ মানসে রীতিমত সাড়া জাগিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সম্প্রদায়বাদী রাজনীতি, দাঙ্গা, মন্বন্তর ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীল ও আপোষকামিতার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রতিবাদী লড়াইয়ে নেমেছিল। কিন্তু দুষিত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কুপ্রভাব এতটা প্রবল ও ব্যাপক হয়ে ওঠে যে তা জয় করা সাংস্কৃতিক কর্মীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরিণামে ১৯৪৭ সালে রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে দেশ বিভাজিত হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এই বলিষ্ঠ প্রকাশ পঞ্চাশের দশকে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে তথা পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় প্রভাব রেখেছে, প্রেরণা জুগিয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্তের কবিতা, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরীর গণসংগীত, বিজন ভট্টাচার্য্যের 'নবান্ন' বা 'জবানবন্দী'র মত মঞ্চনাটক; বিনয় রায়, সাধন দাশগুপ্ত বা নিবারণ পণ্ডিত প্রমুখের তেভাগার গান এবং সেই সাথে রমেশ শীলের কবিগান মুসলিম লীগের স্বৈরশাসন ও প্রচণ্ড দমননীতির মুখেও প্রতিবাদী সংস্কৃতি চর্চার আলো জ্বালাতে সাহায্য করেছে। ভাষা আন্দোলন আমাদের রাজনীতি ও চিন্তায় এক বিরাট পরিবর্তন ঘটায় এবং ব্যাপকভাবে এর প্রভাব পড়ে

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে, যার গতিমুখ ছিল প্রগতির দিকে। কিন্তু পাকিস্তানী রাজনীতির ক্রমাগত বাঙালি বিরূপতা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও একইসাথে সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত করে তোলে এবং সেই ধারায় প্রতিবাদ ব্যাপকমাত্রা অর্জন করে, তুলনায় শ্রেণী চেতনা, শ্রেণী সংগ্রামের ধারা পিছিয়ে পড়ে। সংস্কৃতি ও রাজনীতি ঘিরে পরিস্ফুট জাতীয়তাবাদী চেতনার এই আবেগ বাঙালি জনগোষ্ঠীকে প্রতিবাদে-সংগ্রামে এককাট্টা হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী, পেশাজীবী, আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণী এতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। এরই প্রকাশ সত্তরের নির্বাচনের ফলাফলে, এমনকি একাত্তরেও। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বে এই শ্রেণীর হাতেই ধরা ছিল ক্ষমতার সব কলকব্জা।

স্বাধীনতা উত্তর এই দীর্ঘ সময় সমাজ ও রাজনীতি একাধিক বিপরীত স্রোতের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। এর সবই পুঁজিপতি শ্রেণী বা পুঁজির স্বার্থের অনুকূলে। রাজনীতিতে আমলা (সামরিক-বেসামরিক), মুৎসুদ্দি পুঁজি ছাড়াও সাম্রাজ্যবাদী কর্পোরেট পুঁজির প্রবল প্রভাব বিদ্যমান। বাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-সহ সাম্রাজ্যবাদী অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান দেশের অর্থনীতি ও সেই সূত্রে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। জাতীয়তাবাদীতার স্বাধীন চৈতন্য ও সর্বজনীন স্বার্থ সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে পুরাপুরি বিসর্জন দিয়েছে। দেশ শাসিত হচ্ছে কথিত দুই বিপরীতধর্মী জাতীয়তাবাদী দলের বা ধারার মাধ্যমে, যারা আসলে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এরা কেউ জনস্বার্থের পক্ষে নয়, উভয় ধারাই সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী স্বার্থের প্রতিভূ। এই দ্বি-দলীয় ধারার শাসন পর্যায়ক্রমে রাজনীতিকে দুষিত, দুর্নীতিগ্রস্ত ও সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর করে তুলেছে। রাজনীতিতে দুর্নীতি, অর্থ ও পেশীশক্তি এখন প্রবল রূপ ধারণ করে নির্ধারক ভূমিকায় উপস্থিত হয়েছে। এছাড়া সমাজ স্থানিক ও বৈশ্বিক উভয়দিক দিয়ে নানা অশুভশক্তির প্রভাবাধীনে চালিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের বদৌলতে সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি ও তাদের ভোগবাদী আদর্শ সমাজে যথেষ্ট প্রভাব রাখছে। পেশিশক্তি, দুর্নীতি, লুটপাটের মাধ্যমে দ্রুত গড়ে ওঠা পুঁজিপতি শ্রেণী ও তাদের ভোগ বিলাসিতা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে ক্যারিয়ার আদর্শে দীক্ষিত তরুণ সমাজকে। সমাজ পরিবর্তনের আদর্শ এদের মনযোগ কাড়তে পারছে না, আত্মপ্রতিষ্ঠাই এখন তাদের লক্ষ্য, ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠেছে।

লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মীসহ নানা পেশার মানুষ রাজনীতির এই দ্বি-ধারায় বিভক্ত। সকলক্ষেত্রে এমন বিভাজন এতটা নির্দিষ্ট ও ব্যাপক বিভাজন এর আগে দেখা যায়নি। এর সাথে বড় সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মীয় উস্কানী ও সমাজে উগ্র ধর্মীয় চিন্তার বিভ্রান্তির প্রভাব। এর বাইরে মুক্তবুদ্ধির ও আদর্শিকভাবে দৃঢ় চেতনার শিক্ষিতজন সংখ্যায় অল্প এবং গণমানুষের পক্ষের প্রগতিচেতনার রাজনৈতিক ধারাটিও বেশ দুর্বল। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এর প্রভাব পড়বে অবশ্যম্ভাবীভাবে। সে কারণেই সংস্কৃতিতে জনস্বার্থের এবং সমাজ পরিবর্তনের পক্ষের শক্তির উপস্থিতিও বেশ দুর্বল।

বর্তমানে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গন আগের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল চেহারায় উপস্থিত। বর্তমান ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার বাইরে থাকা শাসকশ্রেণীর দলগুলো যারা বিগত অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরে শাসন-শোষণ লুটপাট করে চলেছে তাদের রাষ্ট্রক্ষমতাকেন্দ্রিক পরস্পর আস্থাহীনতা, খেয়োখেয়ি এক অমানবিক, কুৎসিত চেহারায় হাজির হয়েছে। এই নোংরা লড়াইয়ে শুধু

গণতান্ত্রিক পরিবেশ সংকটাপন্ন হচ্ছে তাই নয়, জনগণের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এই শাসক শ্রেণী দেশের স্বার্থ, মর্যাদা, সার্বভৌমত্ব সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে বিকিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি সবই এই সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ-লুটপাটকারী-পাচারকারী শক্তির কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে, আর জনগণ নিপতিত হয়েছে চরম সংকট ও অসহায়ত্বের মধ্যে।

আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই রাজনীতি অর্থনীতির পক্ষেই কাজ করছে, এই শোষণ-বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তাদের রাজনীতি অর্থনীতির সেবাদান করছে। সুতরাং সেই সংস্কৃতির চরিত্র প্রচলিত রাজনীতির তল্পিবাহক ভিন্ন অন্য কিছু হবার নয়। এই সংস্কৃতিসেবীরা নানা সুযোগ-সুবিধার জন্য ক্ষমতাসীন সরকার ও শাসকদের কর্মকাণ্ড মহিমান্বিত করা এবং মোশাহেবী, গুণকেত্তনের নানা তৎপরতায় ব্যস্ত। দেশের তেল-গ্যাস, প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন কিংবা সাম্রাজ্যবাদ-অধিপত্যবাদের স্বার্থে প্রাণ-প্রকৃতি বিনাশী কোন প্রকল্প যেমন তাদেরকে চিন্তিত করে না, তেমনি দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন উর্ধ্বগতি, জনগণের প্রতিদিনের বেঁচে থাকার তীব্র অমানবিক সংগ্রাম তাদেরকে স্পর্শ কিংবা বিচলিত করে না। এই লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশ লুটপাটকারী, লুম্পেন বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠীর উচ্ছিষ্টভোগী। সুতরাং ক্ষমতাসীন সরকার ও গোষ্ঠীর শাসন, নির্যাতন, লুটপাট তথা শোষণ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে অটুট ও নিরাপদ রাখতেই তাদের যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজন। ফলে এসকল সাংস্কৃতিক আয়োজনে জনগণ আগ্রহ-উৎসাহ হারিয়েছে, সেখানে জনগণের উপস্থিতিও খুব একটা দেখা যায় না। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সবচেয়ে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় মাধ্যম নাটকেও বর্তমানে দর্শকের খরা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেখানে দর্শকরা দেশের প্রকৃত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক চিত্র, জনগণের জীবন-সংগ্রাম অথবা তাদের মনের অব্যক্ত কথা খুঁজে পাচ্ছেন না।

আজ দেশব্যাপী এই সাংস্কৃতিক সিন্ডিকেটের নেতৃত্ব দিচ্ছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, সেটা গড়ে উঠেছিল এরশাদ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে, আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে। তখন দেশের অধিকাংশ শ্রেণী পেশার মানুষ ও সংগঠন জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়েছিল। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক, লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজীবী, সংস্কৃতিকর্মী সকলেই আন্দোলনে নেমেছিলেন অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করার জন্য। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক জোটে বিভিন্ন দল-মতের সাংস্কৃতিক কর্মী ও সংগঠন একত্রিত হয়েছিল। রাজধানীকেন্দ্রিক এই জোটের প্রধান নেতৃত্বের অধিকাংশই ছিলেন বাম প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সদস্য, সমর্থক অথবা প্রগতিশীল চেতনায় বিশ্বাসী। তাঁদের তৎপরতা ও জোটের কর্মসূচিতে স্পষ্টভাবে তার ছাপ লক্ষ্য করা যেত। সেসব কারণে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সাংস্কৃতিক তৎপরতা একটা বিশেষ মাত্রা ও প্রগতিবাদী বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পেরেছিল, জনগণের কাছে ব্যাপক আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। সংস্কৃতি কর্মীরাও সমাজে একটা মর্যাদার আসন লাভ করেছিলেন। ফলে দেশব্যাপী ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র-তরুণ-যুব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছিলেন। সে সময় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংস্থা হিসেবে ঢাকার আদলে সারাদেশে স্থানীয় পর্যায়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাংস্কৃতিক জোট গড়ে ওঠে। যদিও দেশের কয়েকটি স্থানে ঢাকার আগেই সাংস্কৃতিক কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম গড়ে উঠেছিল। তীব্র গণআন্দোলন ও অনেক মানুষের জীবনদানের মধ্যদিয়ে আন্দোলনকারী

তিনটি রাজনৈতিক জোটের রূপরেখা অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে।

'৯০ পরবর্তী নানা 'নির্বাচনী' প্রক্রিয়ায় কয়েকবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হাতবদল ঘটেছে, কিন্তু স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের এই দীর্ঘ সময় পরেও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার যেসমস্ত দাবি-দাওয়া ছিল তার কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর থেকে মূলত দ্বি-দলীয় বৃত্তের মধ্যেই ক্ষমতার হাতবদল ঘটে চলেছে। নির্বাচনে অর্থ বিনিয়োগ, পেশি শক্তি, পুলিশ প্রশাসন ইত্যাদি ব্যবহার করে এই দল দুটোর মধ্যে ক্ষমতার পালাবদল ঘটছে। আবার অনেক সময় ভোট ছাড়াই অথবা আগের রাতে ব্যালট বাক্স ভর্তির নির্বাচনী প্রহসনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হচ্ছে। 'নির্বাচিতরা' স্বৈরাচার হয়েছে, এরশাদ স্বৈরাচারের দলও যোগ দিয়েছে 'নির্বাচিত' স্বৈরাচারের সাথে। ভোটের অধিকারের সাথে জনগণের বাক-ব্যক্তি স্বাধীনতা, প্রতিবাদের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারও হরণ করা হয়েছে। সর্বশেষ সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করে মত প্রকাশের ন্যূনতম অধিকারও রুদ্ধ করে দিয়েছে, অত্যাবশ্যক পরিষেবা আইনের মাধ্যমে শ্রমিক ধর্মঘট বন্ধসহ জেল, জুলুম, খুন, গুম চলছে নির্বিচারে। নানা ধরনের নিবর্তনমূলক আইন, নির্যাতন, দমন-পীড়নের মধ্য দিয়ে সরকার ক্রমে চরম নির্যাতনকারী, স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠেছে।

যে স্বৈরাচারের উৎখাত আন্দোলনের ভিতর দিয়ে সাংস্কৃতিক জোটের জন্ম সেই বিশ্ববেহায়ার রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি তার উৎখাতকারীদের সাথে এখন মহাজোট সরকারে গলা জড়াজড়ি করে একাকার। তার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কোন প্রতিবাদ-প্রতিক্রিয়া, আন্দোলন নেই, ঘৃণাও নেই। থাকার প্রশ্নও ওঠে না, কারণ তারা এখন একাত্মা। আসলে সাংস্কৃতিক জোটের নেতৃবৃন্দও রাজনীতির পালা বদলে নিজেদের প্রগতিশীল অবস্থান পরিত্যাগ করে ক্ষমতাসীনদের দলে ভিড়েছেন, নানা পদ-পদবী, সুযোগ-সুবিধার সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাদের কাছে এরশাদ ও তার দল এখন আর স্বৈরাচারী বা অগ্রহণযোগ্য কোন শক্তি নয়, নিজেরাই যখন সেই চরিত্র ধারণ করেছেন! এই শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী তথা সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের অধিকাংশই সকল ধরনের নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার জন্য চরম সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান গ্রহণ করেছেন। প্রক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেনিন একবার বলেছিলেন, "এরা মৃত মায়ের চামড়া ছাড়িয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে পিছপা হয় না... ।' খেতাব ও টাকার জন্য ওরা সব পারে।" ফলে স্বৈরাচারী-ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বা দাবি নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করা এই জোটের এবং নেতৃবৃন্দের পক্ষে আর সম্ভব নয়, ব্যক্তিস্বার্থ এবং ক্ষমতাসীন সরকারের লেজুড়বৃত্তিই এখন তাদের মূল কর্মসূচি। বর্তমানে তারা নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে স্বৈরাচারী সরকার ও শাসক শ্রেণীর শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন ও লুটপাটের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন সংগ্রাম গড়ার চেতনা ও সক্ষমতাকে বাক্সবন্দী, ছিনতাই ও বিপদগামী করার দায়িত্বই পালন করছেন।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ঔপনিবেশিক শাসকরা 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' এর মাধ্যমে লেখালেখি, নাট্যাভিনয়সহ মত প্রকাশের অধিকার হরণ করেছিল। সেই নিবর্তনমূলক আইন পাকিস্তান পর্ব পার করে বাংলাদেশ পর্বেও বহাল ছিল। জনবিরোধী এই আইন বাতিলের জন্য এদেশের সাংস্কৃতিক কর্মীদের দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের কথা সকলের জানা। সেটা ছিল এদেশের সাংস্কৃতিক কর্মীদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। সম্প্রতি লেখালেখি বা অন্য কোনভাবে জনগণের মত

প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের চেয়েও ভয়ানক এক নিবর্তনমূলক আইন প্রবর্তন করেছে। 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' এর নাম পরিবর্তন করে সেটি এখন 'সাইবার নিরাপত্তা আইন' নামে জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এ আইনে অনেক লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, রাজনীতি ও ছাত্র আন্দোলনের কর্মীকে আটক করা হয়েছে। অনেকেই জেল হাজতে মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন, কারাগারে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। এসব কারণে স্বাভাবিকভাবে দেশের যে কোন নাগরিক স্বাধীনভাবে লিখতে বা মত প্রকাশ করতে ভীত সন্ত্রস্ত বোধ করছেন। এ আইনের মধ্যদিয়ে লেখক, শিল্পী, গবেষক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীসহ জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও অধিকার মারাত্মকভাবে খর্ব করা হয়েছে। গণবিরোধী ও নিবর্তনমূলক এ আইনের বিরুদ্ধে সংস্কৃতিকর্মীসহ দেশের নানা শ্রেণী পেশার মানুষ প্রতিবাদ সংগ্রামে সোচ্চার হয়েছেন, রাজপথে প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করছেন। দুর্ভাগ্য হলো, দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বৃহত্তম প্ল্যাটফর্ম ও তার নেতৃবৃন্দ এই জনবিরোধী, জঘন্যতম নিবর্তনমূলক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা তো দূরের কথা বিবৃতি পর্যন্ত দেননি। সরকার নাখোশ হতে পারে এমন কোন কর্মসূচি দেয়া যে তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এসকল ঘটনাই তার প্রমাণ বহন করে।

গত কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিপুল আয়োজনে ভারতের একটি নাট্য উৎসবের নামে প্রচলিত এবং সেই আদলে 'গঙ্গা-যমুনা নাট্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব এর আয়োজন করা হচ্ছে। এ উৎসবে ভারত থেকে অনেক নাটকের দল অংশগ্রহণ করে থাকে। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং দু'দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব গড়ার ক্ষেত্রে এমন আয়োজনের গুরুত্ব রয়েছে। এ সকল আয়োজনের মধ্য দিয়ে দু'দেশের পারস্পারিক সম্পর্ক এবং জনগণের মধ্যকার নানা সংকট ও সম্ভাবনাগুলো উঠে আসার সুযোগ সৃষ্টি হয়। দুঃখজনক হলো আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ ভারত ফারাক্কা, তিস্তা, টিপাইমুখ বাঁধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করার দিকে নিয়ে চলেছে, নদীগুলোর নাব্য কমে যাচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে; বর্ষাকালে হঠাৎ অতিরিক্ত পানি ছেড়ে দিয়ে বন্যায় ডুবিয়ে মারছে; বাংলাদেশের জনগণের জীবন-জীবিকা, কৃষি, জলবায়ু, প্রতিবেশ-পরিবেশের উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এসব নিয়ে যেমন, তেমনি ভারত আন্তর্জাতিক সকল নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে বাংলাদেশের উজানে ৫৪টি অভিন্ন আন্তর্জাতিক নদীর পানি সরিয়ে নিচ্ছে সে বিষয়েও আয়োজকরা কোন কথা বলেন না। ভারত সীমান্তে প্রায় প্রতিদিন বাংলাদেশের নাগরিক হত্যা করা হচ্ছে সে বিষয়ে তারা নিশ্চুপ, বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়ে ফেলানী কাঁটাতারে ঝুলে থাকলেও তারা প্রতিবাদ করেন না। বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির উপর ভারতের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যবাদী ভূমিকার বিরুদ্ধে তাদের টু শব্দটি করতে শোনা যায় না। এসব বিষয়ে নিশ্চুপ থাকা অথবা প্রকারান্তরে ভারতের আধিপত্যবাদী ও আগ্রাসী ভূমিকাকে আড়াল করার মাজেজা কী? এগুলো তো সংস্কৃতি বহির্ভূত কোন বিষয় নয়, দেশ এবং জনগণের স্বার্থ ও জীবন জীবিকার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তাহলে এতো বিপুল বাজেটের এসব উৎসব আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেশের বা জনগণের কী প্রাপ্তিযোগ ঘটছে? সাংস্কৃতিক জোটের নেতৃবৃন্দই তো এসকল উৎসব আয়োজনের উদ্যোক্তা এবং প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকেন। এরকম অনেক উদাহরণ দেয়া যাবে। আসলে তাদের প্রায় সকল কর্মসূচি ও আয়োজনে সাধারণ জনগণের জীবন জীবিকার সংকট প্রাধান্যে থাকে না, মুখ্য থাকে সরকারের গুণগান আর লেজুড়বৃত্তি। সরকারের জনবিরোধী

ভূমিকার ব্যাপারে তাদের মুখে তালা দেয়া থাকে। সুতরাং এই ধরনের নেতৃত্ব এবং সাংস্কৃতিক জোটের প্রতি মোহগ্রস্ত থাকার কোন অবকাশ নেই। যদিও জোট গঠন ও আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রগতিশীল, সংগ্রামী চেতনার অনেক সাংস্কৃতিক সংগঠন ও ব্যক্তি এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত রয়েছেন। এ রকম বাস্তবতায় দেশ ও জনগণের পক্ষের প্রকৃত প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ব্যক্তি, সংগঠন, শিল্পী, সাহিত্যিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং বিদ্যমান ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলা জরুরি কর্তব্য হয়ে উঠেছে।

চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এমনকি নিরুপায় হয়ে শাসকদের গোষ্ঠির মধ্যে থেকেও জনগণের শিল্পী-সাহিত্যিকরা জনগণের পক্ষে কাজ করে যান। প্রকৃত শিল্পী-সাহিত্যিকরা জনগণের মুখপাত্র সুতরাং শোষকের জয়গান গাইতে গাইতেও তারা শোষিতের ইতিহাস বলে দিয়ে যান। লু সুন চীনের আধুনিক সাহিত্যরীতির জনক। জাপানের সেনদাই মেডিকেল কলেজে দু'বছর পড়ার পর চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়া ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরেছিলেন, মনোনিবেশ করেছিলেন লেখালেখিতে। কারণ তৎকালীন পরাধীন চীনা কিছু ছাত্রের দুর্বল ও নতজানু মানসিকতা দেখে তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন- ডাক্তারি পড়ে অসুস্থ মানুষের দেহের রোগ সারানোর চাইতেও উত্তম কাজ হবে তাদের মনের রোগ সারানো, তাদের চেতনাকে জাগ্রত করা। পরাধীন চীনের তৎকালীন চরম নির্যাতনমূলক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে সহসিকতার সাথে জনগণের বিপ্লবী সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়ে তোলার মধ্যদিয়ে চীনা জাতি ও জনগণের মনোজগতে পরিবর্তন সাধন করা, সচেতন ও সাহসী করতে তৎপরতা চালিয়েছিলেন। তাঁর জীবনকালে সংঘটিত প্রায় প্রতিটি আন্দোলনে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর সময়ের এমন কোন সমস্যা ছিল না যা তাঁর রচনায় স্থান পায়নি। চীনা জনগণের বিপ্লবীচেতনা ও চীন বিপ্লবের ভিত্তি নির্মাণে তিনি অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। রাশিয়ায় জারের দুঃশাসন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিখ্যাত রুশ লেখক ম্যাক্সিম গোর্কি নানা ধরনের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক তৎপরতা ও রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। তাঁর 'মা' উপন্যাস রুশ জনগণের মনে জুগিয়েছিল অমিত সাহস, রুশ বিপ্লবে রেখেছিল অনন্যসাধারণ ভূমিকা।

সংস্কৃতির মূলে রয়েছে মতাদর্শ। এই মতাদর্শ শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের। এটা কোনোভাবেই ভুললে চলবে না যে, সাংস্কৃতিক সংগ্রামটা মতাদর্শিক। সাংস্কৃতিক আন্দোলন মতাদর্শের উপর ভিত্তি করেই এগিয়ে যায়। আমাদের দেশের শাসক শ্রেণীর চেতনা লুণ্ঠন, ভোগবাদিতা ও বিচ্ছিন্নতার আদর্শে ভরপুর এবং তারা সেটা নির্বিবাদে চাপিয়ে দেয় সমগ্র জনগণের উপর। সুতরাং মতাদর্শিক সংগ্রামের আবশ্যকতা কোন অবস্থায় অবহেলা বা ভুললে চলবে না। শাসক শ্রেণী ও তার পক্ষের লেখক-বুদ্ধিজীবী এবং সমস্ত ধরনের সংগঠন-প্রতিষ্ঠান ও তাদের প্রচলিত ব্যবস্থা মতাদর্শের ব্যাপারে জনগণকে সবসময় বিভ্রান্ত করে এবং বিদ্যমান শোষণ-শাসন প্রক্রিয়ার বৈধতা ও তার পক্ষে সম্মতি আদায়ের তৎপরতা চালায়। সেটাতে শেষ পর্যন্ত রক্ষা না হলে রাষ্ট্রীয় শক্তিসহ সমস্ত শক্তি নিয়ে জনগণের উপর ঝাপিয়ে পড়তে দ্বিধা করে না। কিন্তু জনগণের পক্ষের প্রকৃত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ও রাষ্ট্রীয় শক্তির শতবাধা, জেল-জুলুম, নির্যাতনের কাছে আত্মসমর্পন বা পরাভূত না হয়ে সাহসের সাথে তাদের স্বপ্নের কথা, মানবিক, সাম্যের পৃথিবীর কথা বলে যান।

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কবিতা লেখার অপরাধে তুরস্কের কবি নাজিম হিকমতের ৬১ বছর জীবনের ১৭ বছরই কেটেছিল স্বৈরশাসকের কারাগারে বন্দী অবস্থায়। তাঁর কবিতায় বিপ্লব আর স্বপ্নের জানান

দিয়েছিলেন তিনি, দেখিয়েছিলেন সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন, এক মানবিক সমাজের গল্প। স্বৈরশাসকের অত্যাচারে টিকতে না পেরে এক সময় দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু স্বৈরাচারী শাসকের সাথে আপোস করেন নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল কবরটা অন্তত জন্মভূমি তুরস্কের মাটিতে হবে, সে ইচ্ছাটাও পূর্ণ হয় নি এই বিপ্লবী কবির। তাঁর শেষ ঠিকানা হয়েছিল রাশিয়ার মস্কোতে। একইভাবে আমেরিকার প্রখ্যাত গায়ক ও অভিনেতা পল রোবসন-এর গান পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছিল। নানা বৈষম্য ও বর্ণবাদের শিকার এই শিল্পী কয়লা শ্রমিকসহ নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কথা বলতেন। অবহেলিত কালো মানুষদের অধিকার ও সম্মান আদায়ের জন্য রুখে দাঁড়াতেন। এই ভূমিকার জন্য আমেরিকার ইতিহাসে নজিরবিহীন নজরদারীতে রাখা হয়েছিল গণমানুষের এই শিল্পীকে এবং এক সময় তাঁর পাসপোর্ট কেড়ে নেয়া হয়েছিল। রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে আট বছর তাঁর গান গাওয়া নিষিদ্ধ করেছিল মার্কিন সরকার। চরম নিপীড়নের মধ্যেও কোন প্রলোভন, ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার জন্য বৈষম্য ও অন্যায়ের কাছে তিনি মাথা নত করেন নি, আপোস করেন নি।

বিরোধ বা দ্বন্দ্বটা কোথায়? শাসক শ্রেণী কী কারণে গণমানুষের পক্ষের, মুক্তচিন্তার, সৃজনশীল ও সংগ্রামী মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে? দ্বন্দ্বটা হচ্ছে ব্যাপক মানুষের শ্রমে উৎপাদিত সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের আত্মসাৎ বা কুক্ষিগত করা এবং অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষের শোষিত-বঞ্চিত হওয়ার মধ্যকার দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ ক্রমাগত ধন-বৈষম্যের দ্বন্দ্ব। শ্রম আত্মসাতের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠা সম্পদ বা পুঁজির মালিকের সাথে সম্পদহীন মানুষের দ্বন্দ্ব। এই পুঁজিপতি শ্রেণী ক্ষমতায় থেকে ব্যাপক শ্রম শোষণ, লুটপাট ও নির্যাতনের মাধ্যমে অধিকতর সম্পদের মালিক হয়। এই শ্রেণী তাদের পুঁজি রক্ষায় এবং আরো অধিক পুঁজির জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, সাম্রাজ্যবাদী-ফ্যাসিবাদী চরিত্র ধারণ করে, এমনকি যুদ্ধে অবতীর্ণ পিছপা হয় না। এই বৈষম্যমূলক ও অমানবিক সমাজকে টিকিয়ে রাখতে জনগণের অধিকার হরণ করতে হয় এবং এর বিরুদ্ধে যারা জনগণকে সচেতন করেন সেই সকল মানুষের লেখা, কথা বলা, মতপ্রকাশের অধিকার হরণ করতে হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে সেই অবস্থা বিরাজ করছে।

তাহলে সমাধান কী? সমাধান হলো সম্পদের সুসম বন্টন, ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সম্পদের সামাজিক বা যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠা। এটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং বর্তমান পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী-ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তে জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ছাড়া সমাধান সম্ভব নয়। যে কোন আন্দোলনের প্রধানতঃ একটা লক্ষ্য থাকে, হয় সংস্কারমূলক নয়তো পরিবর্তনমূলক। সংস্কারমূলক আন্দোলন প্রচলিত ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন চায় না। অন্যদিকে পরিবর্তনমূলক আন্দোলন প্রচলিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে চায়। আমাদের লড়াইটা হওয়া উচিৎ আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে। আর সমাধানটা সেখানেই নিহিত।

শেষ বিচারে কাজটা তাই রাজনৈতিক এবং লড়াইটা সর্বাত্মক; রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতি সবকিছুকে জড়িয়েই। এখানে আপোষ বা দ্বিধার কোন অবকাশ নেই। জনগণের পক্ষের প্রকৃত শিল্পী-সাহিত্যিকরা শোষণ-বৈষম্যমূলক রাষ্ট্র-সমাজ ব্যবস্থার সাথে আপোস করতে পারেন না, তাঁর চেতনা, দায়বদ্ধতা, বিবেক তাঁকে বাধা দান করে। ফ্রান্সের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও লেখক জঁ পল সাঁত্রে, সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েও যিনি তা নিতে সম্মত হননি তাঁর 'লেখা বা সাহিত্য কী?' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন- "আমি

কোন অত্যাচারী শ্রেণীর স্বগোত্রে থাকতে পারিনা।... স্বৈরাচার কিংবা ফ্যাসিবাদে লেখকের মুক্তি নেই। সাহিত্য ও শিল্পের প্রকৃত ধর্মই হলো, লেখক কিংবা শিল্পী ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচারে সে স্বস্তি পাবে না। ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচারের দেয়া কিছু উপহার কিছু লেখক, শিল্পীর জীবনে বাহ্যিক সুখ এনে দিতে পারে, কিন্তু এতে তার মনের সুখ থাকবে কেমন করে? তার শিল্প ও সাহিত্যসৃষ্টি হয়ে যায় বন্ধ্যা। তার হৃদয় বাঁধা পড়ে দাসত্বে। একেক সময় আসে যখন স্বৈরাচার ও শাসক শ্রেণী জোর করে কলম বন্ধ করে দেয়। তখন লেখককেও অস্ত্র ধরতে হয়। তখন যে-পথে যে-মতে চলেন না কেন, সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টির জন্য লেখকের বিবেক লেখককে লড়াইয়ের মাঝপথে এনে ফেলে। এই লড়াইয়ের মধ্যেই লেখকের নতুন সৃষ্টি।" সাঁত্রের মতে, লেখকের, শিল্পীর মুক্তি এখানেই। কিন্তু এজন্য প্রয়োজন মুক্ত, স্বাধীন মন; দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি ভালবাসা, কর্তব্যবোধসম্পন্ন, বিবেকবান, সাহসী মানুষ। নতজানু ব্যক্তিস্বার্থে বুঁদ হয়ে থাকা কোনো মানুষ সমষ্টির কল্যাণ করতে পারে না। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক আবুল ফজল 'সংস্কৃতি ও মুক্ত চিন্তা' প্রবন্ধে বলেছেন, "...স্বাধীন মনই সব সভ্যতার বাহন আর সব সভ্যতার নির্মাতা। সে স্বাধীন মনের অধিকার হারালে মনুষ্যত্ব বলতে আমাদের আর কিছু থাকবে না। তখন সভ্যতার মানে দাঁড়াবে খোসামত তোষামতে দক্ষতা। ...সরকার চায় 'ইয়েস ম্যান' বা হ্যাঁ হুজুর অথবা ভয়ে কাবু হয়ে থাকা নির্বীর্য মানুষ। ...পৃথিবীতে কোনো দিন কোনো 'ইয়েস ম্যান' কিছু গড়ে তোলে নি, করে নি কিছুই সৃষ্টি। হ্যাঁ হুজুর কখনো সৃজনশীল হতে পারে না। সাহিত্য, শিল্প, নাটক, সংগীত, শিল্পকলা ইত্যাদি সবকিছুই স্বাধীন মন ও স্বাধীন শিল্পী প্রতিভারই অবদান। কিন্তু তার জন্য মুক্ত হওয়া আর স্বাধীন পরিবেশ অত্যাবশ্যক।"

এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য বাংলাদেশের বর্তমান শোষণ-বৈষম্যমূলক চরম অমানবিক, ভীতিকর, স্বৈরাচারী-ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন জোরদার করার বিকল্প নেই। সে আন্দোলনে লেখক শিল্পী সংস্কৃতিকর্মীদের সচেতন প্রয়াশ অবশ্য কর্তব্য। দার্শনিক প্লেটো বিশ্বাস করতেন, শিল্প যেমনই হোক একটা কিছু শিক্ষা দেয়, আর সেটা কুশিক্ষাও হতে পারে। প্লেটোর লেখায় বারবার একথা এসেছে যে, শিল্প যেহেতু আনন্দ দেয়, তার পক্ষে কুশিক্ষা দেয়া আরো সহজ। সুতরাং শিল্প-সাহিত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে বিষয়টিকে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতা এবং ব্যাপক অধিকাংশ মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করলে আমাদের গান-নাটক-কবিতা-নৃত্য-চিত্রকলা ইত্যাদি কেবলমাত্র হাস্য, তামাশা কিংবা মনোরঞ্জনের উপাদান বা খোরাক জোগানোর জন্য সৃষ্টি হতে পারে না, বরং প্রধানভাবে দাবি করে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মুক্তি অর্জনের প্রণোদনা সৃষ্টিকারী শিল্প হিসেবে। যেখানে গুরুত্বপূর্ণভাবে স্থান পেতে পারে জনগণের জীবন, স্নেহ, প্রেম, প্রতিদিনের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, শোষণ-লুণ্ঠন-বৈষম্য, নির্যাতন, অধিকারহীনতার নানা চিত্র, তার প্রেক্ষাপট; এই জনপদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জনগণের সংগ্রামী আন্দোলন-সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ঘটনাপ্রবাহ, যা বিদ্যমান শোষণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়তে মানুষকে সচেতন ও সাহসী করে তুলবে; বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণ ও মুক্তির দিক-নির্দেশনা দিবে, চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ করবে। লেখক-শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মীদের এসকল প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা দরকার। আর সেটা সম্ভব না হলে অন্তত সততার সাথে সে উদ্যোগের প্রচেষ্টা নিতে হবে। আমরা যদি সে ভূমিকা গ্রহণ না করি তাহলে ইতিহাস এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বর্তমান

প্রজন্মের শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মীদের কী হিসেবে মূল্যায়ন করবে? কবি সমুদ্র গুপ্ত তাঁর কবিতায় বলেছেন–

যদি স্বাধীন হও তাহলে যুদ্ধ করো
আরো বেশি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করো
যদি পরাধীন হও তাহলে যুদ্ধ করো
মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে তুমি যুদ্ধ করো
প্রত্যেক মানুষ যেমন মানব সন্তান
স্বাধীনতা চিরকাল যুদ্ধের জাতক
কি লজ্জা!
শরীরের যৌবন নিয়ে আমরা এখনো পরাধীন

১০ নভেম্বর ২০২৩
মফিজুর রহমান লালটু, সাধারণ সম্পাদক, বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র